আমি বন্ধু পেয়েছিলাম

দীপেন্দু চক্রবর্তী

আমি ছেলেবেলা থেকে বন্ধু চেয়ে এসেছি। কিন্তু বন্ধু পাই নি। আমি ভাল প্রতিবেশী পেয়েছি, ভাল সহকর্মী পেয়েছি। ওরা সবাই খুব ভাল। কিন্তু মনের কথা বলা যায় না ওদের সাথে। এক আধবার মনের কথা বলে আমি বোকা বনে গিয়েছিলাম। আসলে দোষটা আমার। কেমন করে বন্ধু করতে হয় তা আমি শিখে উঠতে পারি নি। প্রেমের মত বন্ধু তাও যে শেখার ব্যপার তা আমার জানা ছিল না। বড় হয়েছি পারিবারিক ঘেরা টোপে। সবার ছোট বলে সবাই আগলে রাখত— মা, বাবা, দাদা দিদিরা সবাই। এর কারণ দুটি, আমি খুব রুগ্ন ছিলাম এবং আমার একদা - জমিদার অধুনা-নিঃস্ব উদ্বাস্তু পিতৃদেব আমাকে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে দিতে চাইতেন না। কেননা ওরা অধিকাংশই নীচু জাত, এবং বস্তিবাসী। জানালা দিয়ে যখন ওদের ফুটবল খেলতে দেখতাম ওরা কেউ কেউ আমাকে ডাকত। আম ার সাহস ছিল না ওদের দলে যোগ দেবার। আমি তো জমিদারের ছেলে, সুতরাং আমার বংশ মর্যাদা বজায় রাখার জন্য আমাকে এদের সংস্পর্শ এড়িয়ে ফার্স্ট বয় হতে হবে। এবং আমি ফার্স্ট বয় হয়েই কলেজে ঢুকেছিলাম। সেখানে কিন্তু দেখলাম প্রকৃত গুণীর সন্তানদের। কী তাদের পোষাক, কী তাদের ঠাটবাট। কফি হাউসে তারা পকেট থেকে তারা তাড়া নোট বার করত। আমার বংশমর্যাদা সেখানে পাত্তা পেত না। আমার কলেজের বন্ধুরা আমাকে ভাল ছাত্র হিসেবে অবশ্যই একধরনের স্বীকৃতি দিত, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কোথায় যেন একধরনের করুণা প্রকাশ পেত ওদের আচরণে। আমিও এমন ক্যাবলা ছিলাম যে তাদেরকেই মাঝে মধ্যে মনের দুঃখের কথা বলে ফেলেছি। এই যেমন, বাবা-মার মৃত্যুর পর দাদাদের সংসারে আমার যন্ত্রনার কথা। ওরা সবাই মুখ চাওয়া চাউই করেছিল। তখন বুঝতে পারি নি। পরে আর এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, ওরা নাকি হাসাহাসি করেছিল। খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু এর জন্য নিজের ভাগ্যকে দায়ি করেছিলাম। আমি কবি হতে চেয়েছিলাম, ছবি আঁকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার সেই মনের ইচ্ছেটাকে কেউ মেনে নেয় নি। বাড়ির সবাই চেয়েছিল আমি ভাল নম্বর পাই। আর এক এই ভাল নম্বর পেয়েই আমি বি.এ পাশ করলাম। কিন্তু ঠিক এই সময়েই আমি বিদ্রোহী হয়ে উঠলাম। এম.এ.না পড়ে ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়ে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতে লাগলাম। ভুলে গেলাম দাদা - দিদিদের। কিন্তু বন্ধু পাবার আকাঙ্খাটি কিছুতেই পিছু ছাড়ল না। যার সঙ্গেই আলাপ হয় তাকেই আমি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলাম।

একজন আর্টিস্টের সঙ্গে আলাপ হল। যেহেতু আমিও আর্টিস্ট হতে চেয়েছিলাম তাই তাকে আমি সহজেই 'আপন করে নিলাম। বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে আমি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছি। ছেলেটি অনেকটা আমারই মত। বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। নানান জায়গায় আর্ট এগজিবিশন করে, নানান গ্রন্থের প্রচ্ছদ আঁকে। ও বলল, আপনার একটা কবিতার বই বার করুন, আমি বিনে পয়সায় প্রচ্ছদ এঁকে দেবো।' তাঁর কথায় উৎসাহিত হয়ে আমি প্রচুর কবিতা লিখে একটা ফাইল বানালাম। সে একদিন এসে বলল, 'আমাকে দশ হাজার টাকা দিতে পারবেন। এগজিবিশনের জন্য একজনের কাছে ধার করেছিলাম। সে আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখে নি। শুনতে পাই, সে এখন প্যারিসে থাকে, এবং আর্টিস্ট হিসেবে খুব নাম করেছে। বুঝতে পারলাম, সে আমাকে আর যাই হোক বন্ধু ভাবে নি। আবার দুঃখ পেলাম। তবু আমার বন্ধুত্বের লোভ গেল না।

ঠিক সেই সময় আমার কলেজের বন্ধুরা হাজির হল আমার ফ্ল্যাটে। ওরা সবাই এখন প্রতিষ্ঠিত ও বিবাহিত। কিন্তু ওদের সেই কলেজের বন্ধনটা ছেঁড়ে নি। এতদিন পরে ওরা আমাকে মনে করেছে এটা ভেবেই আমি অভিভূত। আমি তো এখনও বিয়ে করিনি, এবং ঠিক করেছি বিয়ে করব না। দাদা-দিদিদের বিবাহিত জীবনের কুশ্রী চেহারাটা দেখে ঠিক করেছিলেন চিরকাল ব্যাচেলার থাকব। কিন্তু এটাও জানতাম একজন ব্যাচেলর রাজার মত বাঁচে, এবং কুকুরের মত মরে। আমার কলেজের বন্ধুরাও আমি কেন বিয়ে করছি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে নি। কেননা সপ্তাহান্তে হুইস্কির বোতল ও মুরগির মাংস খাইয়ে আমি তাদের বন্ধুত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলেছিলাম। সে এক বড় সুখের সময়। সারা রাত কত কথা, কত গান, স্মৃতিচারণ। এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটতেই ওরা কেমন কর্পুরের মত উবে গেল। কোথায় গেল ওরা। পরে শুনলাম ওরা সবাই সপরিবারে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গেছে, সেখানে এই ব্যাচেলার বন্ধুটি বড় বেমানান লাগত।

আমি বুঝতে পারলাম আমার কপালে বন্ধু নেই। অতএব বিবাহ ছাড়া আমার উদ্ধার নেই। যে কথা সেই কাজ। বয়স বেড়ে গেছে বলে, এবং আধুনিকাদের সম্বন্ধে সংশয় ছিল বলে এক নিম্নবিত্ত ও স্বল্প শিক্ষিত পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে ফেললাম। মেয়ের মা আমাকে অনেক কিছু দিতে চাইলেন। আমি বললাম, 'না, আমি শুধু আপনার মেয়েকে চাই।' মনে মনে বললাম, ও আমার জীবনসঙ্গিনী, ও আমার বন্ধু হবে, এর চেয়ে আর কি চাওয়ার আছে। ফুলশয্যার রাত্রে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে তাই প্রথম কথাটি ছিল এইরকমঃ 'তুমি বলো, তুমি আমার বন্ধু হবে। তোমাকে আমি মনের কথা খুলে বলব।' নববধূর সে কি প্রতিক্রিয়া। তার হাসি থামতেই চায় না। সে বলল, 'কী যে বল। তুমি আমার হ্যাজব্যান্ড। আমার বন্ধুরা এ কথা শুনলে হাসবে না।'

আমি বললাম, 'তোমার বন্ধুরা মানে'।

তার উত্তরে সে বলল, 'কেন, যারা আমাকে পিড়িতে করে ঘোরালো। জানো, ওরা সবাই আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।' আমি আর কথা বাড়াই নি। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম বন্ধুত্বের লোভে আমি এখন একটা খাঁচায় বন্দী হয়ে গেলাম। আমি দেখলাম আমার বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করলেও আমার স্ত্রীর বন্ধুরা তাকে ত্যাগ করে নি। বরং যোগাযোগের উপায়টা বাড়িয়েই চলেছে।

নিজের বোকামিতে দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা সেন্টিমেন্টাল পথ বেছে নিলাম। কাছের রেলস্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম এই হাস্যকার জীবনটাকে শেষ করার জন্য। ট্রেন আসে, ট্রেন যায়, আমি বসে থাকি একটা বেঞ্চে। কী করব বুঝতে পারছি না। হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমার পাশে এসে বসে আমার নাম ধরে সম্বোধন করলেন। আমি চমকে উঠলাম।

—আপনার সঙ্গে কফি হাউসে আলাপ হয়েছিল।

—তাই নাকি।

—শুধু তাই নয়। এই মুহূর্তে আপনি যা ভাবছেন আমিও তাই ভাবছি।

—কীরকম।

—পৃথিবীটা কীরকম নির্বান্ধব হয়ে গেছে, তাই না।

—আপনি কী করে বুঝলেন।

—কারণ, আমিও বিবাহিত, এবং তবুও বন্ধু খুঁজে বেড়াই। যাই বলুন, মনের কথা বলার মানুষ আজকের দিনে যেন খুঁজেই পাওয়া যায় না।

ভদ্রলোকর কথায় আমি কেমন বশীভূত হয়ে গেলাম। একজন বিবাহিত মানুষ যদি আমার মত বন্ধু খঁজে বেড়ায় তবে আমরা দুজনেই তো বন্ধু হতে পারি। জেগে উঠল আমার বন্ধুত্বের সেই অপ্রতিরোধ্য কামনা। তারপর ক' দিনের সংলাপ টেলিফোনে, অবশেষে তার বাড়িতে নিমন্ত্রন। অনেক কথা, অনেক খাওয়া দাওয়ার পর আমার জীবনের শেষ বন্ধুটি আমার হাতে কয়েকটি বিদেশি প্রডাক্ট দিয়ে বললেন, 'আসুন না, অ্যামওয়ের সংগঠনে। ওখানে সত্যিকারের বন্ধু পাবেন।